যেতে ! আজ মাইনে দেবার পর মা বললে, চারটি মাছের ঝোল ভাত খেয়ে যাও চাঁপা।...ভাত খাওয়ার পর খোকাবাবু তাকে গল্পে গল্পে জিজ্ঞাসা করেছে, সিঁদুর মাখানো শিঙ্গিমাছ খেতে তেতো, না ভাল ?...সিঁদুর মাখানো শিঙ্গিমাছ ? ওয়াক দিয়ে বমি আসবার যোগাড় ! সিঁদুরে যে পারা থাকে ! খেলে যে গা দিয়ে কুষ্ঠ বার হয়।...মায়ের কাছে চেঁচামেচি করতেই গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এল গুলটেনের-মা। সে তুকতাক জানে। নিজে শিঙ্গিমাছ এনে মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। মাইজীকে বলে সেই মন্ত্রপড়া শিঙ্গিমাছ তাকে খাইয়ে দিয়েছে। আরও কি কি করেছে সে-ই জানে। বলছে যে আর কেউ চাঁপার দিকে ফিরেও তাকাবে না, গায়ে কুষ্ঠ বেরুবে ; যেমন পরের চাকরি খেতে গিয়েছিলি তেমনই শাস্তি !...চাঁপার কপালে কি এও ছিল ! কি করেছিল সে যে সবাই মিলে তাকে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে সিঁদুরমাখানো শিঙ্গিমাছ খাইয়ে দিল ! সে এখনই গিয়ে ক্যাম্পের ডেপুটি সাহেবকে বলে গ্রেপ্তার করাবে গুলটেনের-মাকে ! বাবু আপনি এর বিচার করে দিন।...

চাঁপা বাবুর পায়ে মাথা কোটে।

তাঁকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে প্রশান্ত। দুটো টাকা আর একখানা পুরনো শাড়ি খেসারত দিয়ে তাকে অতিকষ্টে বিদায় করতে হয়। চাঁপা চলে গেলেও ভয় যায় না—সে আবার ক্যাম্পে গিয়ে এ নিয়ে হইচই না বাধায় ! তাহলে কেলেঙ্কারির একশেষ !

শৈল অঝোরে কাঁদছে !

গুলটেনের-মায়ের পরামর্শে, তার কপালে ঠেকানো শিঙ্গিমাছ চাঁপাকে খাওয়ানো, ছেলেমানুষি না ? কিন্তু কি করবে প্রশান্ত শৈলকে ? স্ত্রীর চেয়েও বেশি ছেলেমানুষি সে নিজে করেছে এঁটো বাসনগুলোর উপর কুলকুচো-কুলকুচো খেলা করে।

http://www.elearninginfo.in

## হারানো সুর

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রবিবারের সকাল। মেসের বড় ঘড়টায় সবাই জটলা করছে। রণদা, হারু, দ্বিজেন, ঋষি এবং অনাদি। বেহারের একটা মফস্বল শহরে বাঙালি যুবকদের ছোট মেস, ছয়জন, মেম্বার, কেউ মাস্টার, কেউ ড্রাফট্‌স্‌ম্যান, কেউ কেরানি, কেউ বিশেষ কিছু নয়। রবিবারের মজলিসে উপস্থিত নেই শুধু বিমান। ওর বাড়ি পাশেই আর একটা শহরে। রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে থাকে না, সকালের গাড়িতে চলে যায়, তারপর আবার দশটার গাড়িটাতে এসে অফিস করে। সেই গেছে।

একটা খবরের কাগজের পাঁচখানা পাতা পাঁচজনের হাতে। পড়ছে না কেউ। অনাদির হাতের পাতাটায় পাকিস্তান নিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভ ; তাই কেন্দ্র করে আলোচনাটা জোরদার হয়ে উঠেছে, ঋষি হাত ঘড়িটা দেখে বলল—'হয়েছে, আর নয়, নটা বাজে। কে কুটনো কুটবে, কে মসলা বাটবে, কে উনুন ধরাবে, কে রান্নার দিকে যাবে ঠিক করে ফেলো, নৈলে কপালে আজ হরিমটোর।'

কাল ঝি-মাগিটা বাড়ি যাওয়ার সময় মাথা ধরার জন্য খুঁতখুঁত করতে করতে গেছে। এখনও আসেনি ; তার ওপরে পাচকঠাকুরও কোঁ কোঁ করতে করতে বিছানা নিয়েছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা আত্মপ্রকাশ করছে শহরে।

ঋষির কথায় সবাই একটু হট্টগোলের সঙ্গেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে, একটি স্ত্রীলোক একটি আন্দাজ বছর চারেকের ছেলের হাত ধরে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। বিধবা, আধঘোমটা দেওয়া। ছেলেটির পরনে একটা হাফ্ প্যান্ট আর হাফ্ শার্ট। খুব ছেঁড়া বা অপরিষ্কার নয়।

ঐ হট্টগোলটা একটু অন্যদিকে ঘুরে গেল—

'ঐ নাও, পাকিস্তান সশরীরে !...আর কত পারে লোকে বলো বাছা, নিত্যিই এসে জুটছে।...খেটে খাও না কেন ? ঐ তো দেখছ, সিন্ধি-পাঞ্জাবিরা....দেখেও শেখে !'

খুব রূঢ় না হলেও বিরক্তি ফুটে বেরুচ্ছে কথায়। নিত্যকার ব্যাপার, তার ওপর মেজাজও ঠিক নেই কারুর আজ। স্ত্রীলোকটি একভাবেই দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টি নত করে। ছেলেটির দৃষ্টি ওর মুখের ওপর, মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে নিয়ে কারুর কারুর ওপরে ফেলছে। দ্বিজেন বেরিয়ে আসতে আসতে গলাটা নরম করে নিয়েই কি বলতে যাচ্ছিল, হয়তো অন্য সময় আসবার কথা, এমন সময় হট্টগোলটা আবার একটু মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—'ঝি এসে গেছে !...বিল্‌টার মা এসে গেছে !...তুম হামসাবকো বাঁচায়া বিলটার মা !...এত্তা দেড়ি কাহে কিয়া—হাম সাবকো ধড়মে প্রাণ নেহি থা !...কেয়সা হ্যায় বিল্‌টার মা....'

হারু বলল—'তা হলে তুই রেঁধেও দে বাছা—আজ জাত-জাত করলে আর চলে না। আজ ঠাকুর বিমার পড় গিয়া।'

'তাহলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে।'—দ্বিজেন মন্তব্য করল। ঝিকে বলল—'তোম সব কাম ছোড়কে পয়লা চুল্‌হাঠো ধরায়ে দেও।'

ওদিক থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়ায় স্ত্রীলোকটিকে বেশ ভদ্রভাবেই বলল—'আপনি তাহলে ওবেলায়ই আসুন একবার। দেখি কতটা কি করতে পারি। দেখতেই পাচ্ছেন বড় বিব্রত রয়েছি এখন—বাজার-হাট কিছুই হয়নি, তার ওপর আজ আবার হেঁসেলও ঠেলতে হবে।'

'আপনাগোর ঠাকুর অসুস্থ হৈয়া পড়ছে ?'—প্রশ্ন করল স্ত্রীলোকটি। এই প্রথম কথা।

দ্বিজেন বলল—'হ্যাঁ। দেখুন না নিগ্রহ।' দুটো কথা বাড়িয়েই বলল। চুপ করে একবার মেসটার ওপর নজরটা বুলিয়ে নিয়ে কি যেন একটু ভাবল স্ত্রীলোকটি, তারপর কুণ্ঠিতভাবে বলল—'আমি রাইন্ধা দিলে খাইবান ?' প্রশ্ন, তবে এতটা অদ্ভুত অনুনয়ের ভাব ফুটে উঠেছে, যেন এতবড় একটা অনুগ্রহের আশাই করতে পারছে না।

সবাই দোরের কাছেই জড়ো হয়ে রয়েছে, পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। স্ত্রীলোকটি বলল—'আমি বৈদ্য।'

হারু বলল—'না, জাতের কথা এমনি বলছিলাম। তা আপনি আবার কষ্ট করতে যাবেন কেন ? অযথা সময় যাবে তো ?'

'আমার আবার সময় !'—একটু ম্লান হাসল স্ত্রীলোকটি।

অনাদি পেছনের দিকে ছিল। মুখটা একটু দ্বিজেনের দিকে বাড়িয়ে এনে চাপা গলায় বলল—'দিন ; কতদিন যে বাড়ির রান্না খাইনি।'

ঋষি বলল—'তা, উনি যখন নিজেই বলছেন।'

'মন্দ কি ?'—দ্বিজেন বলল, 'ছেলেটিও রয়েছে—দুজনে এক মুঠো করে খেয়ে যেতে পারবেন। ততক্ষণ আমরাও না হয়...'

রণদার দিকে চাইতে সে বলল—'হ্যাঁ, কাছাকাছি একটু ঘুরে যদি কিছু তুলতে পারি...'

'অ ঝি, তুমি করো কি ! রও, আমারে আইস্‌তা দ্যাও'—হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে বারান্দার ওদিকে ঝিকে উদ্দেশ করে বলে উঠল স্ত্রীলোকটি, সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্নভাবে এদের মধ্যে থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এগিয়ে চলল।

নীচে দোকান, ওপরতলায় সারি সারি তিনখানা ঘর আর একটা চওড়া বারান্দা নিয়ে মেস। বারান্দার এক প্রান্তে একটুখানি জায়গা ছ্যাঁচা বেড়া দিয়ে ঘিরে রান্নাঘর। দরজা নেই, প্রায় সমস্তটাই খোলা, একদিকে দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি একজোড়া উনুন। ঝি একটা ঝাঁটা বুলিয়ে পরিষ্কার করতে যাচ্ছিল, নজর পড়ায় ছুটে এসেছে স্ত্রীলোকটি। দাঁড়িয়ে পড়ে একটু কত্রীত্বের টোনেই বলল—'ওকি, উনানে ঝাঁটা দ্যাও কেন্ ?'

ঝি বুড়ি গোছের। হঠাৎ এভাবের তম্বিতে যতটা বিস্মিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হয়ে উঠেছে, নিজের ভাষাতেই জানাল, 'কেন, হয়েছে কি ? ঝাঁটা না বুলিয়ে পরিষ্কার করা যাবে কি করে ?'



'তুমি সরো গিয়া, সইরা আইস। আমি বাৎলায়ে দিচ্ছি, কেমন কৈরা অইব...'

এত আকস্মিক সমস্তটুকু যে ওরা খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল, তারপর হয়তো পাগল বা ঐরকম কিছু মনে করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। দ্বিজেন বলল—'ঐভাবেই করে ও, মেসই তো।'

'তা হোক্ মেস। উনানে ঝাঁটা দিলে মা-লক্ষ্মী ছাইড়া যান। তুমি খানিকটা ভালো মাটি গুইল্যা আনো ঝি, আমি বাৎলায়ে দিচ্ছি।...তোমরা যাও গিয়া আপন আপন কাজে। বাজার আনবে কইছিলে না ? মাছ বেশি কৈরা আনবা—মুসুর দাইল, ধনেশাক—একটা নারিকেল—কাঁচা মরিচ...'

'আজ্ঞে, আমরা লঙ্কা বেশি খাই না'—ভয়ে ভয়ে বলল রণদা—'আর তরকারিতে ধনেশাক...'

'তোমরা আনো গিয়া ধন আমার। যা কইছি শোন। তোমাদের পেটে মরিচ সয় না আমি জানি। যাও গিয়া বেলা হইছে।' ঝিয়ের দিকে চেয়ে আবার সেই কত্রীত্বের টোন ফিরিয়ে এনে বলল—'তুমি হাঁ কৈরা দাঁড়ায়া করো কি ? বুড়া হইছ, উনানে ঝাঁটা দিলে মা-লক্ষ্মী ছাইড়া যান জ্ঞান নাই ! যাও, আনো গিয়া মাটি গোলা। উনিকে আগলায়া-আগলায়া রাখতে হয় ; অনাচার সইবার মাইয়া উনি ?'

গুটি ছয়েক পুরুষের নিতান্তই শ্রীহীন আবাস একটি ; ঘণ্টা তিনেক যে ছিল, মা লক্ষ্মীকে ডেকে এনে যেন সত্যই আটকে রাখল স্ত্রীলোকটি। ফরমাশ করে করে আরও সব জিনিস আনাল বাজার থেকে। একটা রহস্য অবশ্য লেগেই রইল—উদ্বাস্তু, হয়তো একটু মস্তিষ্ক-বিকৃতি—হতে পারে, সুযোগ পেয়ে একদিন একটু সাধ মিটিয়ে খাওয়ার লোভই, বাচ্চাটিও তো রয়েছে সঙ্গে—কিন্তু মস্তিষ্ক-বিকৃতির খারাপ রকম কিছু নয় দেখে ওরাও নির্বিচারেই জোগান দিয়ে গেল। রবিবারের বাজার, পূর্ববঙ্গের বিচিত্র রন্ধন-শৈলী—মাছেরই কয়েকটি পদ—চুকা ডাল, তিতা ডাল, সমস্ত মেসটি গন্ধে ম-ম করছে—তারই মধ্যে একটি সুমিষ্ট প্রত্যাশার সঙ্গে ওদের এই রহস্যময় শুভ আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল।

শ্রী বা লক্ষ্মী শুধু রন্ধনশালাতেই নয়। একবার এক ফাঁকে, হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে এসে দোরের সামনে দাঁড়াল। এ ঘরটি বড়, তিনটে সীট, চৌকিতে অগোছালভাবে বিছানা পাতা, তিনটি টেবিল, তিনটি আলনা—তাদেরও অনুরূপ অবস্থা। একবার দেখে নিয়ে গোছাতে আরম্ভ করে দিল, নিজের মনেই, তবে নীরবে নয়। মুখভার করে মৃদু অনুযোগ—এভাবে থাকতে আছে ? বেটা ছেলেরা পারে না, কিন্তু ঝিমাগীটা করে কি ? এই তো তিনটি ঘর, এক চিলতে বারান্দা। না পারে, অন্যমানুষ্ রাখতে হবে....

বিছানা পর্যন্ত ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠিক করে দিয়ে প্রশ্ন করল—'পাশের ঘরটা কার ?'

ঋষি অনাদিকে দেখিয়ে বলল—'আমি আর এ থাকি।'

'আইস গিয়া একজন, ঠিক কৈরা দিই। এমন কৈরা থাকে না, মা-লক্ষ্মী গোসা করেন।'

'আপনি গিয়ে দিন না গুছিয়ে। আমি তো বলি দরকারই বা কি ?'—ঋষি বলল।

'এই দেখো, ছেলে কয় দরকার কি। না, ওঠ, আইস। কোথাকার কে তাকে ঘর ছাইড়া দিবে ক্যান্ ? তোমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম বাবা, একথা আমি অবশ্যই কইব। ন্যাও, আসো।'

পরের ঘরটিও। ঐ রকম ডেকে নিয়ে। কেউ 'বড় ছেলে' কেউ 'মেজো ছেলে'। কারুর বা শুধু নামটা। কাউকে কিছু বাজারের ফরমাশ করে, কাউকে হেঁসেলে ডেকে কিছু চাকিয়ে বেশ একটু কর্ম-চঞ্চলতা এনে ফেলল। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝিয়ের ওপর তম্বি ; ছেলেটি চঞ্চল, সাদামাটা মেসের মধ্যেও শিশুসুলভ খেলায় যে বিশৃঙ্খলা এনে ফেলছে তার জন্য তিরস্কার—সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ সংসারের ছোট একটি হরিৎ-কেন্দ্র জেগে উঠল মেসের মরুবক্ষে।

মাত্র ঘণ্টা তিনেক। রান্না শেষ হলে আবার এসে খানিকটা বকাবকি—'এখনও স্নান হয়নি কারুর ? শরীর খারাপ অইব যে !'

'আমাদের শরীর খারাপ হয় না। মেসের জীব।'—হেসে বলল ছিজেন।

'শোন কথা বড় ছেলের। ওনাগোর লোহার শরীর। কত যে লোহার শরীর তা চক্ষু দিয়া দেখছি না তো। যাও গিয়া সব, অবাধ্য হইবা না। আমি পোলাটারে খাওয়াইয়া লই। কি কও ?'

'আপনিও খেয়ে নিন না। সকাল থেকে কিছু মুখে দেওয়াতে তো পারলাম না।'—হারু বলল।

'কি কস্ তরা ! তোগোর পেটে ভাত নাই, আমি গরাস তুইল্যা খাবার লাগমু !'

একটু হেসেও ফেলল প্রস্তাবটার বৈচিত্রে। নাওয়ার তাগাদা দিয়ে ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে রন্ধনশালার দিকে চলে গেল। এক ফাঁকে ওর স্নানের ব্যাপারটা সেরেই রেখেছিল।

প্রচুর এবং রুচিকর ব্যঞ্জন-সংযোগে আহার পর্ব নিষ্পন্ন করল সবাই। সবটুকুকে আরও রুচিকর যা করে তুলল তা একটি মায়ের প্রাণ—উপরোধে, অনুরোধে, এমন কি মৃদু ভর্ৎসনার মধ্যে দিয়ে সে প্রাণ নিজেকে ব্যক্ত করে ধরল—'হ্যাঁ, আরও লাগব—একটু দিই চুকা দাইল ; তোমারে একটু চিড়ামুড়া না খাইলে শরীর থাকব কেমন কৈরা—লোহার শরীর যে কইতেছে ?'

উপরোধ-অনুযোগ-ভর্ৎসনা, সেও কিন্তু একটু অপরূপ প্রফুল্লতার মধ্যে, যেটা রান্নাঘরে প্রবেশ করা থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেই ওর মুখটাকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। ওদের খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেটা যেন লুপ্ত হয়ে গেল।

ওরা সেটা টেরই পেল না বলা চলে। কারুর নজরে যদি একটু ধরা দিয়েই থাকে পার্থক্যটা তো ভূরিভোজনের পর ভোজনের কথা নিয়েই যে আলোচনা চলল তার মধ্যে সেটা তলিয়ে গেল।

বেশ ভালো করেই নিজেদের মধ্যে একটা চাঁদা তুলল। বিকালে ওকে নিয়ে বেরুবে



সবাই। বড় ঘরটার মধ্যে পান সিগারেটের সঙ্গে চলল জল্পনা-কল্পনা। কিন্তু আর পাওয়া গেল না ওকে।

ওর আহারের জন্য সম্ভবমতো সময় দিয়ে দ্বিজেন বাইরে এসে দেখল, রান্নাঘরে নেই। ঝি অনেক আগেই কাজ সেরে চলে গেছে। উদ্বৃত্ত অন্নব্যঞ্জন সব যেমনকার তেমনি পড়ে আছে।

ওপরে খোঁজ করবার মত অলিগলি, কোণকোণ কিছু নেই। ওরা নীচে নেমে কাছে-পিঠে খুঁজল। নেই দুজনের কেউ। বিকালে মেসে তালা দিয়ে ওরা শহরের বাঙালি অঞ্চলগুলো ভাল করে গিয়ে খুঁজল। কোথাও, কেউ আসেনি ওরকম।

সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে বড় ঘরটায় সবাই বসেছিল। মনটা বড় অবসন্ন হয়ে রয়েছে। শুধু তো বেদনাই নয়, একটা অসমাহিত রহস্যেরও ভার। এভাবে হঠাৎ না খেয়ে, কিছু সাহায্য না নিয়ে চলে গেল কেন ? পাগল ? তাহলে যে ছেলেটির জন্য মনটা আরও টনটন করে ওঠে।

বিমান এসে উপস্থিত হল। প্রশ্ন করল—'তোমরা এমনভাবে বসে যে ? আমার আজকেই চলে আসতে—' সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কথা চাপা দিয়ে বলল—'আচ্ছা, সকালে একটি স্ত্রীলোক এসেছিল ? এই ধরো বছর পঞ্চাশ বয়স, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে।'

'হ্যাঁ, এসেছিল...কেন বল তো ?...জান কিছু তার সম্বন্ধে ?'—সবাই উদ্বিগ্নভাবে জড়াজড়ি করে প্রশ্ন করল।

'স্টেশনে ওয়েটিং রুমের বাইরের বেঞ্চটায় বসে ছিল। বড় মর্মান্তিক কাহিনী হে, একটি ভরা সংসারের সবাইকে খুইয়ে ঐ একটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে কোনো রকমে এসে উপস্থিত হয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে। আমার কাছে বিশেষ কিছু ছিল না। দুটি টাকা, সে দুটি দিয়ে মেসের ঠিকানা বলে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তোমরা কিছু তুলেও দিতে পারবে ভেবে।'

'সেই চেষ্টা করছিলাম। সে কিন্তু অপেক্ষা না করে হঠাৎ কখন চলে গেল।'

'তার মানে ?'

সব কথা শুনল বিমান। তারপর ওদের মতই খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আমার কি মনে হয় জান ?'

কোন প্রশ্ন না করে সবাই মুখ তুলে চাইল ওর দিকে।

বিমান বলল—'ঐটুকুর মধ্যে কতদিনের হারানো যে জিনিসটা পেল, টাকা নিলে সেটার অমর্যাদা করা হত না ?'

'অমর্যাদা ?...কেন ?...টাকা নিলে দোষটা...কিছু তো খেলেও...'

—সবার প্রশ্ন মন্তব্য কিন্তু অসম্পূর্ণই রয়ে গেল মুখে। একটা বিষণ্ণ মৌন নেমে এল ঘরটাতে। বিমানের কথাকটা আস্তে আস্তে রহস্যটার ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিচ্ছে।